(R)

অটিজম সমাজের বোঝা নয়

ডা. ফারহান আজাদ

অটিজম সম্পর্কে বাংলাদেশে সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে নেতিবাচক। অনেকে বিষয়টি সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ বলেও মনে করে। অটিজম শব্দটি গ্রীক শব্দ 'অটোস' থেকে এসেছে। এর অর্থ স্বয়ং বা স্বীয় বা নিজ। আর ইংরেজি অটিজম এর বাংলা অর্থ আত্মসংবৃতি বা মানসিক রোগবিশেষ। এই রোগে আক্রান্ত শিশুরা অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের গুটিয়ে রাখে। এজন্য এটিকে অটিজম নামকরণ করা হয়েছে।

অনেকেই অটিজমকে সিজোফ্রেনিয়া বলে ভুল করেন। ১৯৪৩ সালে আমেরিকার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লিও ক্যানার সর্বপ্রথম মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে রোগটি সনাক্ত করেন এবং অটিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। দ্য আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাগুয়েজ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী অটিজম হলো শিশুর বিকাশজনিত অসমর্থতা, যার বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রবল ঘাটতি এবং ক্রিয়াকলাপ ও মনোযোগের চরম সীমাবদ্ধতা এবং নিদিষ্ট কিছু আচরণের পুনরাবৃত্তি। অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ, সামাজিক কল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা লক্ষণীয়।

বর্তমানে সারা বিশ্বে অটিজম নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। এ সমস্যার প্রকৃত কারণ এখনো চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেনি। তবে কেউ কেউ মনে করেন, অটিজমের পিছনে জিনগত সমস্যা ও পরিবেশের বিষাক্ত উপকরণের প্রভাব রয়েছে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর ডিএনএ জিনে কপি নম্বর অব ভেরিয়েন্ট (CNV) নামক ত্রুটি বহন করে। পরিবেশের বিষাক্ত উপকরণ জিনের ওপর কাজ করে স্নায়ুকোষ ধ্বংস করে। যেসব রাসায়নিক দ্রব্য অটিজমের জন্য দায়ী তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মার্কারি, লেড, পেস্টিসাইড; গর্ভাবস্থায় মার ধুমপান, এলকোহল বা ক্ষতিকর ঔষধ এসবের প্রভাবে অটিস্টিক শিশুর জন্ম হতে পারে।

এএসডি আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে মস্তিষ্কের সেরোটোনিন বা অন্যান্য নিউরোট্রান্সমিটার অস্বাভাবিক মাত্রায় রয়েছে। এইসব অস্বাভাবিকতা ধারণা দেয় যে ভ্রুণ বৃদ্ধির প্রারম্ভিক অবস্থায় মস্তিস্কের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারের মূল লক্ষণ হলো- সামাজিক বা পারিবারিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি।

ভাষাগত দক্ষতার অভাব, বিলম্ব বা দেরিতে ভাষাগত দক্ষতা লাভ , একই শব্দ বা কথা বারবার উচ্চারণ , পূর্ণ বাক্যের পরিবর্তে একটি করে শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদি লক্ষণও অটিজমের ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এএসডি আক্রান্ত শিশুরা নিজের নাম শুনলে সেভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না , পরিবারের কেউ আদর করলে সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখায় না বা কোনো কিছু করতে বলা হলে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখায়। এ ধরনের শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যের উপস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন থাকে , সমবয়সিদের সাথে সময় কাটাতে অনীহা প্রকাশ করে , কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ দেখায়, অন্যের সংসর্গ পছন্দ করে না , বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করে এবং অন্যের দিকে সরাসরি তাকানো থেকে বিরত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট খাবারের প্র তি বিশেষ আসক্তি, খাবারের ক্ষেত্রে রঙ বা বর্ণকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অস্বাভাবিক ঘ্রাণ গ্রহণে আসক্তি প্রকাশ করে থাকে।

এছারা এএসডি আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে শেখার অক্ষমতা, মনোযোগের অভাব, মৃগী রোগ, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার, ডিস্প্রেক্সিয়া (স্বাভাবিক বিকাশ রো ধ), দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, বাইপোলার ডিজঅর্ডার (হঠাৎ ও ঘন ঘন মনের ভাব পরিবর্তন), ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি দেখা যায়। নিয়মিত চিকিৎসা , ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা , সঠিক যত্ন এবং পর্যাপ্ত কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্ত শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভ ব। তবে এই রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যযোগ্য নয়। চিকিৎসায় যাই হোক না কেন এই রোগ যেন না হয় সেদিকে সবার লক্ষ্য রাখা উচিত। অটিজম প্রতিরোধে বেশি বয়সে বাচ্চা নেওয়া থেকে বিরত থাকা , গর্ভধারণ পূর্ববর্তী সময়ে মায়েদের রুবেলা ভেকসিন নেয়া , গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকা, গর্ভাবস্থায় ধূমপান, অ্যালকোহল ও পান/ জর্দ্দা খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এছারা বাচ্চাকে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিনের আওতায় আনতে হবে এবং শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। পরিকল্পিতভাবে গর্ভধারণ করতে হবে, গর্ভাবস্থায় দুশ্চিন্তা না করে পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নিতে হবে, সর্বোপরি প্রসব পরবর্তীতে শিশুর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

অটিজমে আক্রান্ত শিশুর পরিচর্যায় তার খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গম জাতীয় খাবার, দুধ, সুগার ইত্যাদি খাবার কম খাওয়া উচিত। আস্তে আস্তে বাচ্চাকে সামাজিকতা শেখাতে হবে যাতে সে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেইয়ে চলতে পারে। সে যা করতে চায়, তাকে সেটা করতে দেওয়া উচিত। প্রচুর ঘোরাঘুরি করানো উচিত। সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সবকিছু বোঝাতে হবে।

কোনোও শিশু অটিজমে আক্রান্ত মনে হলে দ্রুত এ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় অটিজম নির্ণয় করতে পারলে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজিজ এর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়াগুলো থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। শিশুর কি ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করে , নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য প্রচুর বিশেষায়িত স্কুল আছে, সেখানে তাদের বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা হয়। এ ধরনের স্কুলে ভর্তি র ক্ষেত্রে একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। তিনি পরামর্শ দেবেন , কোন ধরনের স্কুল অটিস্টিক শিশুর জন্য উপযুক্ত হবে। এছাড়া শিশুর সমস্যাভেদে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিমিত পরিচর্যা, স্কুল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সঠিক স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনে সঠিক ওষুধের ব্যবহার শিশুর অটিজমের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকখানি সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও , যথাযথ সচেতনতার সৃষ্টি ও জ্ঞান লাভের মাধ্যমে অটিস্টিক/ অটিজম স্পেকট্রাম ডিজিঅর্ডার এ আক্রান্ত শিশুদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা ও বিকাশ লাভ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে অটিজম ও নিউরো -ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (এনডিডি) ধারণাটির বহুল পরিচিতির পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কন্যা বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে সমাজের বোঝা নয় ; তাদেরকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে আমাদের উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া যায় , এ ধারণাটি তৈরি করেছেন তিনিই। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ অটিজম বিষয়ে সারাবিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর/ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হতে নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে সরকারের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। যেমন-অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা ও সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় ২০১৩ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৮” প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই আইনটির ফলে দেশের বিদ্যমান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কিংবা দুর্ঘটনার ফলে পঙ্গুত্ববরণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি পুর্নবাসন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

সরকার অটিজমে আক্রান্তদের কল্যাণে বদ্ধপরিকর তাই রাজধানীতে অটিজম সংক্রান্ত অনেকগুলো চিকিৎসা সহায়তাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইন্সটিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, প্রয়াস বিশেষায়িত স্কুল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর শিশুরোগ/মনোরোগবিদ্যা বিভাগ সে প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। তাছাড়া সারাদেশে জেলা সদর হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুল, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে এ সংক্রান্ত সেবা দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সারাদেশে ১০৩টি সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের পাশাপাশি সূচনা ফাউন্ডেশন, প্রয়াস,সোয়াক, সিডিডি, পিএফডিএ, স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন, সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিজএ্যাবল (সুইড) বাংলাদেশ, সীড ট্রাস্ট, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, বিউটিফুল মাইন্ড, নিষ্পাপ অটিজম ফাউন্ডেশন, এফএআরইসহ আরও অনেক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার, সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি, অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজিএবলিটিস এর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অটিজম স্পেকট্রাম ডিজিজ এ আক্রান্ত। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। রুপকল্পঃ ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, রুপকল্পঃ ২০৪১ এবং ডেল্টা প্লান বাস্তবায়ন করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে নিয়েই উন্নয়ন ঘটাতে হবে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত কাউন্সেলিং, পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমেই সম্ভব সমন্বিত উন্নয়ন।

#

২২.১২.২০২০ পিআইডি ফিচার